যে কেউ কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে

من تشبه بقوم فهو منهم

< بنغالي >

ড. নাসের ইবন আবদিল কারীম আল-‘আকল

অনুবাদক: ড. মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

من تشبه بقوم فهو منهم

د/ ناصر بن عبد الكريم العقل

ترجمة: د/ محمد أمين الإسلام
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

	ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তার কতিপয় নমুনা।	
২৩.	প্রথমত: ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা।	
২৪.	দ্বিতীয়ত: কবর উঁচু করা ও তার ওপর স্মৃতিসৌধ বানানো।	
২৫.	তৃতীয়ত: নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।	
২৬.	চতুর্থত: শুভ্র কেশে রং ব্যবহার না করা।	
২৭.	পঞ্চমত: দাড়ি মুণ্ডন করা ও গোঁফ কামিয়ে ফেলা।	
২৮.	ষষ্ঠত: জুতা পরিধান করে সালাত আদায় না করা।	
২৯.	সপ্তমত: নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রয়োগে পার্থক্য সৃষ্টি করা।	
৩০.	অষ্টমত: সালাতের মধ্যে ‘সাদল’ বা কাপর ঝুলিয়ে রাখা।	
৩১.	নবমত: নারী কর্তৃক সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেপর্দা।	
৩২.	দশমত: সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।	
৩৩.	একাদশতম: উৎসব, অনুষ্ঠান ও পর্বসমূহ।	
৩৪.	দ্বাদশতম: সাহরী না খাওয়া।	
৩৫.	ত্রয়োদশতম: ইফতারকে বিলম্বিত করা।	
৩৬.	চতুর্দশতম: ঋতুবর্তী নারীদেরকে বয়কট করা।	
৩৭.	পঞ্চদশতম: সূর্য উদয় এবং অস্তের সময় সালাত আদায় করা।	
৩৮.	ষোড়শতম: কোনো ব্যক্তিকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো।	
৩৯.	সপ্তদশতম: বিলাপ করার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির ওপর শোক প্রকাশ করা।	
৪০.	অষ্টাদশতম: বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা।	
৪১.	ঊনবিংশতম: স্বজাতিপ্রীতি অথবা স্বদলপ্রীতি অথবা স্বদেশপ্রীতি।	
৪২.	বিংশতম: মহররম মাসের দশম দিন দিনে শুধু একটি সাওম পালন করা।	
৪৩.	একবিংশতম: নারীদের পক্ষে পরচুলা লাগানো।	
৪৪.	দ্বাবিংশতম: হৃদয়ের কঠোরতা।	
৪৫.	ত্রয়োবিংশতম: বৈরাগ্যবাদ ও দীনের ব্যাপারে কঠোরতা।	
৪৬.	সারকথা	
৪৭.	উপসংহার	

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট তাওবা করি, আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, যিনি তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেছেন:

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

“আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২০]

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি বলেছেন:

«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جُحرَ ضب لتبعتموهم , قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟».

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি ষাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারাদের কথা বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন: তবে আর কার কথা বলছি”?[১]

যিনি আরও বলেছেন:

«من تشبه بقوم فهو منهم».

“যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ, অনুসরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে”।[২]

অতঃপর.......

হে সম্মানিত ভাইসব! কাফিরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদের সামঞ্জস্য বিধান করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে মারাত্মক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, যা ইসলাম সীমাহীন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি তার আমানত যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, তিনি উম্মতকে বহু হাদীসে এবং বিভিন্ন সময় ও সুযোগে কাফিরদের অনুকরণ করার ব্যাপারে কখনও সার্বিকভাবে আবার কখনও কখনও সবিস্তারে সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ এ উম্মতের মধ্য থেকে কতিপয় দল ও গোষ্ঠী এ অনুসরণ-অনুকরণ করার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে, যদিও তাদের তাতে জড়িত হওয়ার পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। আবার সময়ে সময়ে এ কাজের ভয়াবহতাও ভিন্ন ভিন্ন

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন; ‘ফতহুল বারী’: ১৩/৩০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৬৯।

[২] ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ২/৫০; আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেছে উৎকৃষ্ট সনদে, হাদীস নং-৪০৩১; আর আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ‘সহীহ আল-জামে‘ আস-সাগীর’, হাদীস নং-৬০২৫।

পর্যায়ের, তবে সম্ভবত আমার পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলা হবে না যদি এটা বলি যে, এ যুগের মুসলিমগণ যে হারে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করছে, তা অতীতের যে কোনো সময়ে (উম্মত কর্তৃক কাফিরদের) অনুসরণ-অনুকরণ করার চেয়ে অত্যধিক ভয়ঙ্কর পর্যায়ের।

এ বিষয়টির ভয়াবহতা সত্ত্বেও আমি দেখছি গুণীজন ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে খুব কমই গুরুত্ব দিতে। তাই আমি মনে করি যে, মুসলিমগণের জন্য এখন তার বর্ণনা করাটা অতীব জরুরি, যা জ্ঞান অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

এটাই বলতে চেয়েছি, অচিরেই আমি কাফিরদের অনুকরণ করার বিষয়টির কয়েকটি দিক আলোচনায় আনব। কারণ, বিষয়টি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ও প্রলম্বিত; কিন্তু আমাদের জন্য জরুরি হচ্ছে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অতীব প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও জরুরি নিয়ম-কানূন অনুধাবন করা, যার জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর কর্তব্য, যাতে সে আকীদা-বিশ্বাস অথবা ইবাদত অথবা আচার-আচরণ অথবা রীতি-নীতির ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান হতে পারে। সম্ভবত আমি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামান্য কিছু বিষয়ের মধ্যেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।[৩]

প্রথম বিষয়

‘তাশাব্বুহ’ (অনুসরণ-অনুকরণ) বলতে যা বুঝায়

‘তাশাব্বুহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ:

[৩] মূলত এ বিষয়টি ছিল একটি বক্তব্য, যা আমি রিয়াদস্থ ‘মাসজিদে না‘য়ীম’ এর মধ্যে পেশ করেছি; পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক শুভাকাঙ্খী তা বই আকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করল; ফলশ্রুতিতে কিছু টীকা সম্পাদন ও ঈষৎ পরিবর্তন করার পর আমি (তা প্রকাশ করতে) সম্মত হয়েছি।

‘তাশাব্বুহ’ শব্দটি ‘মুশাবাহাহ’ শব্দ থেকে গৃহীত। তার অর্থ হলো: ‘মুমাসালাহ’ বা সাদৃশ্য গ্রহণ, মিল করা; অনুরূপ অপর অর্থ ‘মুহাকাত’ বা অনুকরণ করা, নকল করা; তদ্রূপ অন্য অর্থ হচ্ছে, তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা।

আর ‘তাশবীহ’ মানে হলো: তামসীল বা দৃষ্টান্ত স্থাপন, সাদৃশ্য নির্ধারণ।

পক্ষান্তরে ‘মুতাশাবিহাত’ মানে হলো: ‘মুতামাসিলাত’ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াদি। যেমন, বলা হয়,

أشبه فلان فلانا أي ماثله وحاكاه وقلده

“অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির মতো হয়েছে, অর্থাৎ সে তার সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে, তার অনুকরণ করেছে এবং সে তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে।

‘তাশাব্বুহ’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ:

পরিভাষায় যে ‘তাশাব্বুহ’ তথা অনুসরণ-অনুকরণ করা নিষিদ্ধ করে কুরআন ও সুন্নায় বক্তব্য এসেছে, তা হলো: যে কোনো প্রকার কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের পূজা-পার্বন, তাদের রীতি-নীতি, তাদের আচার-আচরণের অনুরূপ কাজ করা, যা একান্তভাবেই তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত।

অনুরূপভাবে অসৎ ব্যক্তিদের অনুকরণ করা, যদিও তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন। যেমন, ফাসিক (পাপচারী), জাহিল (অজ্ঞ) ও বেদুইন বা যাযাবরগণ, যাদের দীন পরিপূর্ণ হয় নি, যেমন খুব শীঘ্রই তার বিবরণ আসছে।

অতএব, আমরা মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলতে পারি, যা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও পূজা-পার্বনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা শরী‘আতের বক্তব্য বা মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় আর তার ওপর ভিত্তি

করে কোনো গোলযোগেরও উদ্ভব হয় না, তা ‘তাশাব্বুহ’ বা ‘অনুসরণ-অনুকরণ’ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না আর এটাই হলো সংক্ষিপ্ত মূলনীতি।

****

দ্বিতীয় বিষয়

কেন আমাদেরকে কাফিরদের অনুকরণ-অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে?

শুরুতেই আমাদেরকে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে বুঝতে হবে- নিশ্চয় দীনের মূলভিত্তি হলো 'কায়মনোবাক্যে মেনে নেওয়া'। আল্লাহ তা'আলার নিকট জন্য সবকিছু মেনে নেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবকিছু মেনে নেওয়া।

আর 'মেনে নেওয়া' এর অর্থ: আল্লাহ তা'আলার কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদকে সত্য বলে স্বীকার করা, তাঁর নির্দেশ মেনে নেওয়া এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ করা। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদকে সত্য বলে স্বীকার করা, তাঁর নির্দেশ মেনে নেওয়া, তাঁর নিষেধ করা বস্তু বা বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর আদর্শ মেনে চলা।

সুতরাং যখন আমরা এ মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারব, তখন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিৎ হবে:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু এসেছে, তার সবকিছুকে মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয়ত: তাঁর আনুগত্য করা এবং কাফিরদের সামঞ্জস্য বিধান করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা মান্য করা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর বাণী ও তাঁর শরী'আতের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, সেগুলোর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সেগুলোকে মেনে নেওয়ার পর তার জন্য (শরী'আতের বিধি-বিধানের) কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে কোনো বাধা নেই।

তাই আমরা বলতে পারি যে, কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণসমূহ অনেক; যার অধিকাংশই সুস্থ বিবেক ও সঠিক স্বভাব-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ খুব সহজে বুঝতে পারেন।

প্রথমত: কাফিরদের কর্মসমূহের ভিত্তিই হচ্ছে ভ্রষ্টতা ও ফাসাদের ওপর, বিষয়ের ওপর। এটাই হচ্ছে কাফিরদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মূলনীতি। চাই সেসব কর্ম তোমাকে মুগ্ধ করুক অথবা নাই করুক; সেগুলো ফেতনা-ফাসাদপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য হউক; কারণ, কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, পূজা-পার্বন, উৎসব ও রীতিনীতিসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের কর্মসমূহ হয়ে থাকে ভ্রষ্টতা, বিকৃতি ও অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে। তাদের দ্বারা যে সব সৎকর্ম হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্যতিক্রম। সুতরাং যখন তাদের মাঝে কোনো সৎকর্ম দেখতে পাবে, তখন তোমাদের জানা থাকা উচিত যে, এগুলো এমন কর্মের অন্তর্ভুক্ত যার ব্যাপারে তাদের কাউকে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না; যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ۝٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣]

“আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৩]

দ্বিতীয়ত: কাফিরদের অনুকরণ করার বিষয়টি মুসলিমগণকে তাদের অনুসারী বানিয়ে ছাড়বে। আর এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং অবিশ্বাসীদের পথ অনুসরণ করার বিষয় রয়েছে। আর এ ব্যাপারে কঠিন হুমকি প্রদান করা হয়েছে; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء: ١١٥]

"আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস"! [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫]

তৃতীয়ত: অনুসরণকারী ব্যক্তি ও অনুসৃত ব্যক্তির সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া, যা অনুসরণকারী ব্যক্তি ও অনুসৃত ব্যক্তির মাঝে কোনো না কোনো সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ পরস্পরের কাঠামোগত সম্পৃক্ততা, আন্তরিক আকর্ষণ এবং কথায় ও কাজে পারস্পরিক মিল -এগুলো হলো এমন বিষয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী; তাতে লিপ্ত হওয়া কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিত নয়।

চতুর্থত: অনুকরণ করার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফিরদের প্রতি মুগ্ধ বা তুষ্ট থাকার নীতি সৃষ্টি করবে। সেখান থেকে যেমন, তাদের ধর্ম, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, কর্মকাণ্ড এবং তারা যে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তার প্রতি মুগ্ধ থাকা, আর এ তুষ্টি অপরিহার্যভাবে সুন্নাতসমূহ এবং সত্য ও হিদায়াত প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে বাধ্য করবে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং যার ওপর পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি তাদের মতো হয়ে যায় এবং সে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; আর এটা তাকে মুগ্ধ ও তুষ্ট করে; আর অপরদিকে বিপরীত কথা ও কাজ তখন আর তাকে আনন্দ দিবে না।

পঞ্চমত: পরস্পরের অনুকরণের বিষয়টি সম্প্রীতি ও ভালবাসা এবং অনুকরণকারীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে; কারণ, মুসলিম ব্যক্তি যখন কাফিরের অনুসরণ করবে, তখন আবশ্যকীয়ভাবে তার মনের মাঝে তার জন্য বন্ধুত্বের আকর্ষণ পাওয়া যাবে আর এ অন্তরঙ্গতাই নিশ্চিতভাবে মুমিন, সৎকর্মশীল, মুত্তাকী, সুন্নাহর অনুসারী ও দীনের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্ম দিবে; আর এটা আবশ্যকীয়ভাবেই একটি স্বভাবসুলভ ব্যাপার, যা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে; বিশেষ করে যখন অনুসরণকারী নিজে একাকিত্ব অনুভব করে অথবা অনুসরণকারী ব্যক্তি মানসিকভাবে পর্যুদস্ত থাকে, এ কারণে সে যখন অন্যকে অনুসরণ করে, তখন সে অনুসৃত ব্যক্তির মহত্ব, তার প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব এবং উভয়ের মধ্যকার মিল অনুভব করে। এটা যদি কেবল বাহ্যিক মিলেই সীমাবদ্ধ থাকতো তবুও তা হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো, অথচ বাহ্যিক মিল, অভ্যাসের মিল, চাল-চলনে মিল থাকা আবশ্যকীয়ভাবে অভ্যন্তরীণ মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে। আর এটা এমন এক বিষয়, যা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে, মানুষের চালচলনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করে।

এখানে আমি পরস্পর পরস্পরের অনুকরণকারীদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক, মহব্বত (ভালোবাসা) ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি:

যদি কোনো মানুষ ভিন্ন দেশে গমন করে, তবে সে তাতে একাকিত্ব অনুভব করতে থাকে, ফলে সে যদি তার মতো কোনো মানুষকে তার পোষাকের মতো পোষাক পরিধান করে বাজারে চলাফেরা করতে এবং তার ভাষায় কথা বলতে দেখে, তাহলে সে অবশ্যই তার কেন্দ্রিক অনেক বেশি পরিমাণে ভালোবাসা ও

হৃদ্যতা অনুভব করবে। আর এ ভালোবাসা ও হৃদ্যতার পরিমাণ তখন সে অবস্থার চেয়ে বেশি দেখা দিবে যদি এ লোকটিকে সে তার নিজ দেশে প্রত্যক্ষ করত।

অতএব, মানুষ যখন অনুভব করে যে, সে অপরের অনুসারী, তখন এ অনুকরণ মনের মধ্যে তার জন্য নিশ্চিতভাবে প্রভাব তৈরি করবে; এটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু যদি কোনো মুসলিম কোনো কাফিরের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার অনুকরণ করে, তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়! আর এটাই হলো আসল কথা। কারণ কোনো মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো কাফির ব্যক্তির অনুসরণ-অনুকরণ করার বিষয়টি কেবল তখনই সংঘটিত হবে, যখন সে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায়, তার অনুসরণকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করে, তার মত চাল-চলনকে মনে স্থান দিবে, তার ভালোবাসায় মজে যাবে। আর এটাই তাদের পরস্পরের মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করবে। যেমনটি আমরা ইউরোপিয়ান সভ্যতায় অভ্যস্ত মুসলিমগণের মাঝে লক্ষ্য করে থাকি।

ষষ্ঠত: আমাদেরকে (কাফিরদের) অনুকরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে; কারণ, মুসলিম কর্তৃক কাফিরের অনুকরণ করার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে মুসলিমকে নীচ-অপমানিত ও দুর্বল অবস্থানে ফেলবে। ফলে সে নিজেকে হীন ও পরাজিত মনে করতে থাকবে। আর বর্তমানে কাফিরদেরকে অনুসরণকারীদের অনেকেই এ পরিস্থিতির মাঝেই আছে।

তৃতীয় বিষয়

এমন কিছু অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি, যার দ্বারা আমরা নিষিদ্ধ অনুসরণ-অনুকরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে সক্ষম হবো

প্রথম মূলনীতি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এমন সত্য ও বাস্তব সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যা কখনো না ঘটে থাকতে পারে না। (আর তা হলো) **এ উম্মাত অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।** আর আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের অনুসরণ সংক্রান্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ হাদিস, যা ‘সহীহ’ ও ‘সুনান’ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع».

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে”।[৪]

আর এ হাদীসটি ছাড়াও আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, এ উম্মাতের অনেক গোষ্ঠী ও দল কাফিরদের অনুসরণে লিপ্ত হবে। আর তাদের যেসব রীতি-নীতির কথা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেগুলো আকীদা (মৌলিক বিশ্বাস), ইবাদত, বিধি-বিধান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ও যাবতীয় উৎসবকেই অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি আলেমগণ বলেছেন।

এখানে আমাদের পূর্ববর্তীগণ বলতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অপরাপর হাদীসসমূহে ব্যাখ্যা করা

---

৪ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন; ‘ফতহুল বারী’: ১৩/৩০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৬৯।

হয়েছে। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই, তবে সেসব হাদীসের কোনো কোনোটিতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, তারা হলো পারস্য ও রোমবাসী। আবার কোনো কোনোটিতে তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, তারা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণ, আবার কোনো কোনোটিতে তিনি তাদেরকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, তারা হলো কাফির এবং কোনোটিতে তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, তারা হলো মুশরিক। বস্তুত হাদীসের এসব ভাষ্যের এক অংশ অপর অংশকে সমর্থন করে।

অনুরূপভাবে এটা জানাও আবশ্যক যে, উম্মাতের মধ্য থেকে যারা কাফিরদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে, তারা হবে কিছু ফির্কা বা সম্প্রদায়; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, অবশ্যই এ উম্মাতের মধ্য থেকে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের ওপর স্পষ্টভাবে অবশিষ্ট (অটল) থাকবে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত দল, তারা সত্য প্রচার করবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, যে ব্যক্তি তাদেরকে অপমানিত করবে সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে, সেও তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আর এসব লোকজনই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এ দলের মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অন্যতম আবশ্যকীয় বিষয় হলো, তাদের দ্বারা কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ না ঘটা।

সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে উম্মাত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 'তারা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের রীতিনীতির অনুসরণ করবে' বলে যে সংবাদ প্রদান করেছেন, তার মানে হলো এ উম্মাতের কিছু

গোষ্ঠী ও দল, তারা বিচ্ছিন্ন কিছু দল, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদেরকে কাফিরদের রীতি-নীতির অনুকরণ বা অনুসরণ করার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

প্রথমত: এ ব্যাপারে তাঁর সংবাদ পরিবেশন করাটা সতর্ক করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কাফিরদের বেশভূষা ধারণ করা (অনুকরণ করা) থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, কখনও সংক্ষিপ্তভাবে আবার কখনও বিস্তারিতভাবে।

□ **সংক্ষিপ্তভাবে**, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«من تشبه بقوم فهو منهم».

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে"।[৫]

আরও যেমন, এ হাদীসের মতো যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لتتبعن سنن من قبلكم ...».

---

[৫] ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২/৫০; আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেছে উৎকৃষ্ট সনদে, হাদীস নং- ৪০৩১; আর আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, 'সহীহ আল-জামে' আস-সাগীর', হাদীস নং- ৬০২৫।

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে ...।"[৬] সুতরাং এটা হলো সতর্ক করার দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং অনুসরণ-অনুকরণ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে সংবাদ প্রদানের পন্থায়।

অনুরূপভাবে হাদীসের অনেক ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «خالفوا المشركين» (তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর)।[৭] «خالفوا اليهود» (তোমরা ইয়াহূদীগণের বিরুদ্ধাচরণ কর)।[৮] «خالفوا المجوس» (তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর)।[৯] হাদীসের এসব ভাষ্যসমূহ সাধারণভাবে এসেছে।

- **আর বিস্তারিতভাবে,** অচিরেই ইনশাআল্লাহ অষ্টম বিষয়ের আলোচনায় এমন কিছু কর্মকাণ্ডের নমুনা আসবে, যাতে সংবাদ প্রদান ও সতর্ক করার দৃষ্টিভঙ্গিতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, অচিরেই মুসলিমগণের কেউ কেউ কাফিরদের অনুসরণ ও অনুকরণে লিপ্ত হবে।

তৃতীয় মূলনীতি: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংবাদ প্রদান করা যে, তাঁর উম্মাতের মধ্য থেকে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যকে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকবে; যে ব্যক্তি তাদেরকে অপমানিত করবে, সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে, সেও তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

---

[৬] হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন; 'ফতহুল বারী': ১৩/৩০০; মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৬৯।

[৭] অচিরেই তার তথ্যসূত্রের বিবরণ আসছে।

[৮] অচিরেই তার তথ্যসূত্রের বিবরণ আসছে।

[৯] অচিরেই তার তথ্যসূত্রের বিবরণ আসছে।

তবে অনুকরণ-অনুসরণের বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার সময় এ মূলনীতিগুলোর এক অংশকে অপর অংশ থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়; কারণ, আমরা যদি (হাদীসের) এসব ভাষ্যসমূহের এক অংশকে অপর অংশ থেকে আলাদা করি, তাহলে জনগণের কেউ কেউ ধারণা করবে যে, মুসলিমগণের সকলেই (কাফিরদের) অনুকরণ করার মধ্যে ডুবে যাবে। আর এটা কখনও সম্ভব নয়; কারণ, এটা দীন সংরক্ষণ করার বিপরীত ভূমিকা পালন করবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা তা (দীন) সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ঐ তথ্যের বিপরীত, যাতে তিনি বলেছেন: তাঁর উম্মাতের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা সত্যের ওপরে স্পষ্টত অটল থাকবে।

যেমনিভাবে আমরা যদি অপর এ হাদিসটিকে গ্রহণ করি, আর তা হলো: «ستبقي طائفة» (নিশ্চয় একটি দল অবশিষ্ট থাকবে...) এবং যদি প্রথম হাদীসটিকে গ্রহণ না করি, আর তা হলো: «لتتبعن سنن كان من قبلكم...» (তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে), তাহলে জনগণের কেউ কেউ ধারণা করবে যে, এ উম্মাত (জাতি) কাফিরদের অনুকরণ করার মতো কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে মুক্ত।

আর প্রকৃত বিষয় এটা বা ওটা কোনোটাই নয়, বরং নিশ্চিতভাবে মধ্যমপন্থী উম্মাত হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অবিশিষ্ট থাকবে, যারা (কাফির ও মুশরিকদের) অনুকরণ না করে সুন্নাতের ওপর অটল থাকবে। আর অপরাপর জাতি বা গোষ্ঠীসমূহ, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বস্তুত কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ-অনুকরণে জড়িয়ে পড়ার কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে;

সুতরাং যখনই কোনো গোষ্ঠী বা দল সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যাবে তখনই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের রীতি-নীতিগুলোর কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়বে। এর কিছু নমুনা অচিরেই বর্ণনা করা হবে।

****

চতুর্থ বিষয়

যেসব বিষয়ে কাফির ও অন্যান্যদের অনুসরণ-অনুকরণ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে

আর তা চার চার প্রকার:

প্রথম প্রকার: আকীদার বিষয়সমূহ: আর এগুলো অনুকরণের বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে অনুসরণ-অনুকরণ করা কুফরী ও শির্ক। উদাহরণস্বরূপ, সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের পবিত্রতার গুণগান বর্ণনা করা। আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার ইবাদাত করা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সৃষ্ট কাউকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলে দাবি করা, যেমন খ্রিষ্টানগণ বলে: মাসীহ আল্লাহর পুত্র এবং ইয়াহূদীগণ বলে: উযায়ের আল্লাহর পুত্র। অনুরূপভাবে দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা[১০] এবং আল্লাহ তা‘আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা। আর এর থেকে যেসব কুফুরী ও শির্কী বিষয়সমূহ শাখা-প্রশাখা হিসেবে বের হয়ে আসবে, সেগুলো সবই আকীদাগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার: যা উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট: আর উৎসবসমূহের অধিকাংশ যদিও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তা কখনও কখনও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়ে থাকে। সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে শরী‘আতের বহু ভাষ্যে বিশেষভাবে সেগুলোতে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করা থেকে জোরালোভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাই দেখা যায় যে, মুসলিমদেরকে বছরে দু’টি ‘ঈদ উৎসব পালনের ওপর সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

---

[১০] অর্থাৎ সত্য ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, তবে তা গবেষণাগত বিষয়ে মতবিরোধ করার মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ, তাকে দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা বলে গণ্য করা হয় না।

বাকী যেসব উৎসব রয়েছে যেমন, জন্ম উৎসব, জাতীয় বিভিন্ন উৎসব কিংবা নিয়মিত উৎসবসমূহ, যা বছরে একদিন পালিত হয় অথবা মাসে একদিন পালিত হয় অথবা পালাক্রমে একদিন পালিত হয় অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন পালিত হয়, যা জাতির লোকেরা নিয়ম করে পালন করে থাকে -এ সব উৎসবের সবই সুস্পষ্টভাবে হাদীসে আগত নিষিদ্ধ অনুসরণ-অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকার: ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগত শরী‘আতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করা থেকে নিষিদ্ধ করে বহু বক্তব্য বিস্তারিতভাবে এসেছে। তন্মধ্যে অনেক বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য এসেছে, যাতে আমাদেরকে কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে আদায় করা, সাহরী না খাওয়া, বিলম্বে ইফতার করা ইত্যাদি, যে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

চতুর্থ প্রকার: প্রথা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ: উদারণস্বরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ। এটাকে ‘প্রকাশ্য আদর্শ বা সুস্পষ্ট রীতি-নীতি’ বলা হয়ে থাকে। বস্তুত প্রকাশ্য আদর্শ বলতে বুঝায়, আকার-আকৃতি ও বেশভূষার আদর্শ যেমন পোষাক। অনুরূপভাবে চালচলন ও চারিত্রিক রীতি-নীতি। এসব ক্ষেত্রেও অনুকরণ-অনুসরণের নিষিদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয়ভাবেই সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, দাড়ি মুণ্ডন করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, কাফিরদের ইউনিফর্ম জাতীয় পোষাক পরিধান করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা ও নারী-পুরুষে মেলামেশা করা থেকে এবং পুরুষগণ কর্তৃক নারীদের (বেশভূষার) অনুকরণ করা এবং নারীগণ কর্তৃক পরুষদের অনুকরণ করা, ইত্যাদি বিবিধ প্রথা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

****

পঞ্চম বিষয়

তাশাব্বুহ তথা 'অনুসরণ-অনুকরণ' সংক্রান্ত বিবিধ বিধান

অনুসরণ-অনুকরণ সংক্রান্ত সকল বিধান বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একত্রিত করা সম্ভব নয়। কারণ, অনুসরণ-অনুকরণ করার প্রত্যেকটি অবস্থার জন্য একটি বিধান রয়েছে, যা আলেম ও দীনের জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে হাদীসের বক্তব্য ও শরী'আতে মূলনীতিসমূহের সামনে পেশ করে গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু এমন কতিপয় সাধারণ বিধান রয়েছে, যা অনুসরণ-অনুকরণের সকল প্রকারকে বিস্তারিতভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে বিন্যস্ত করে। যেমন,

প্রথমত: কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করার মধ্যে এমন কিছু প্রকার রয়েছে, যা শির্ক অথবা কুফরী; যেমন, আকীদার ক্ষেত্রে অনুসরণ বা অনুকরণ করা এবং কোনো কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুকরণ করা। যেমন তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ ও আকীদা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। উদাহরণত: 'তা'ত্বীল' নীতিতে বিশ্বাস করা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং তাতে বক্রপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট কোনো ব্যক্তির মধ্যে তাঁর অবস্থান করার এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর মিশে যাওয়ার আকীদা পোষণ করা। নবী ও সৎ ব্যক্তিগণের পবিত্রতা বর্ণনায় গুণাগুণ করা, তাদের পূজা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে আহ্বান করা, আর মানব রচিত আইন-কানূন ও বিধিবিধানকে সালিস মানা -এসব কিছু হয় শির্ক, না হয় কুফরী।

দ্বিতীয়ত: কাফেরদের অনুসরণ-অনুকরণ করার মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা অবাধ্যতা ও ফাসেকী (পাপাচারিতা) হিসেবে গণ্য। যেমন, কোনো কোনো প্রথা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ করা। উদাহরণত, বাম হাতে খাওয়া ও পান করা, পুরুষগণ কর্তৃক স্বর্ণের আংটি ও গহনা ব্যবহার করা, দাঁড়ি মুণ্ডন করা, নারীগণ কর্তৃক পরুষদের (বেশভূষার) অনুকরণ করা এবং পুরুষগণ কর্তৃক নারীদের অনুকরণ করা ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: যা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়: আর তা হলো এমন বিষয়, যাতে সিদ্ধান্ত পেশ করার সময় হালাল ও হারামের মাঝে হুকুম দেওয়ার প্রশ্নে অস্পষ্টতার কারণে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কোনো কোনো অভ্যাস ও চাল-চলন ও পার্থিব বিষয়াদির ব্যাপারে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও মুবাহ (বৈধ) হওয়ার মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখন মুসলিমগণ কর্তৃক (কাফিরদের) অনুকরণে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার জন্য তার হুকুমটি মাকরূহ হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

আর একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়: কাফিরদের এমন কোনো কাজ আছে কিনা, যা বৈধ?

জবাবে আমি বলব: পার্থিব কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্য থেকে যা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা বৈধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যার মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যা তাদেরকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে এবং তাদেরকে সৎকর্মশীল মুসলিমগণের মধ্য থেকে আলাদা করে দেয়।

আরও বৈধ বলে গণ্য হবে তা, যা মুসলিমগণের ওপর বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় টেনে আনবে না অথবা যা কাফিরদের জন্য এমন কোনো সুবিধা টেনে

আনবে না, যা মুসলিমগণকে অপদস্থ করার দিকে ধাবিত করে এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়াদি।

অনুরূপভাবে কাফেরদের দ্বারা উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত নির্ভেজাল বস্তুও বৈধ, যাতে তাদের অনুসরণ বা অনুকরণ করার ক্ষেত্রে মুসলিমগণ কোনো প্রকার ক্ষতির শিকার হবে না।

তদ্রূপ শুধু দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা আকীদা ও নৈতিক চরিত্রকে আক্রান্ত করে না, তা বৈধ কর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবার কখনও কখনও কাফিরদের নিকট যে নির্ভেজাল দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, তা থেকে ফায়দা হাসিল করা মুসলিমগণের ওপর আবশ্যকও হয়ে যায়। এখানে ‘নির্ভেজাল’ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এমন জ্ঞান, যাতে তাদের এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অথবা নিদর্শন পাওয়া যায় না, যা (কুরআন ও সুন্নাহর) বক্তব্যসমূহে অথবা শরী‘আতের মূলনীতিমালায় আঘাত করে অথবা মুসলিমগণকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করে। এগুলো ছাড়া বাকি সব বৈধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১১]

---

[১১] মুসলিমগণের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো কাফিরগণের দ্বারস্থ হওয়া থেকে দূরে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাসাধনা করা; মুসলিমগণের মৌলিক কর্তব্য যেমন জিহাদ, সৎকাজের আদেশ, অশ্লীল কাজে নিষেধ, দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজের মত মৌলিক দায়িত্ব পালনের উপর প্রভাব বিস্তার না করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শরী‘আতের নিয়ম-কানূনের নিরাপদ সীমানায় অবস্থান করে যে কোনো জাতি বা যে কোনো দেশের নিকট থেকে শিল্পের মতো পার্থিব বিষয়াদি থেকে মুসলিমগণ কর্তৃক ফায়দা হাসিল করতে কোনো ক্ষতি নেই। যেমনটি করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ ও উম্মাতের পূর্ববর্তী আলেমগণ। তাদের কোনো শিল্প, পেশা, বস্তুগত যোগ্যতা বা দক্ষতা থেকে ফায়দা হাসিল করতে তাঁরা ততক্ষণ পর্যন্ত বারণ করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুসলিমগণের ওপর

অতএব, আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও উৎসবসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ-অনুকরণ হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য! অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুকরণ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে সাব্যস্ত! এগুলোর নিম্ন পর্যায়ে যা রয়েছে, সেটি হয় তাদের প্রথার শ্রেণিভুক্ত হবে। তখন যদি দেখা যায় যে, তা তাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে! আর যদি তা তাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিধানটি হারাম (নিষিদ্ধ), মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও মুবাহ (বৈধ) হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর তা যদি সাধারণ শিল্প ও অস্ত্র শিল্প প্রভৃতির মতো বিজ্ঞান ও স্রেফ পার্থিব বিষয়াদির পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে এ ধরনের বিষয় বৈধ বলে গণ্য হবে, যখন তাকে পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহের সাথে শর্তযুক্ত করা হবে।

****

অপমান ও লাঞ্ছনাকে অবশ্যম্ভাবী করে না তোলে। আর আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আজকের দিনের মুসলিমগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সাধারণভাবে বস্তুগত অগ্রগতির জন্য চেষ্টাসাধনা করা; কিন্তু এটা তাদের দীন প্রতিষ্ঠার সাথে শর্তযুক্ত। আর প্রথমেই জরুরি হলো তার শরী'আত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো, তারপর তারা বস্তুগত উন্নতির জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, তবে যুক্তিসঙ্গত বিষয় হলো, দীন প্রতিষ্ঠা আবশ্যকীয়ভাবেই পার্থিব উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহই মহাজ্ঞানী।

ষষ্ঠ বিষয়

সে সব শ্রেণি যাদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে

শরী'আতের বক্তব্যসমূহ যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে আমরা এসব শ্রেণির অধিকাংশ সম্পর্কে জানতে পারব, যদিও এর মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হবে না, বরং কাছাকাছি পর্যায়ের জ্ঞান অর্জিত হবে।

প্রথম শ্রেণি: সাধারণভাবে সকল কাফির

সুতরাং কোনো প্রকার বিশিষ্টকরণ ছাড়াই সাধারণভাবে সব ধরনের কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে, সকল মুশরিক, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক, সাবেয়ী (তারকা-নক্ষত্র পূজক), নাস্তিক এবং তাদের মতো অন্যান্য ব্যক্তিগণ। সুতরাং ইবাদাত, আচার-আচরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যা কিছু কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর গায়ে হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন:

«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها».

"নিশ্চয় এগুলো কাফিরদের পোষাক-পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি তা পরিধান করো না।"[12] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পোষাক-পরিচ্ছদ যখন

[১২] মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৭।

কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তা পরিধান করা বৈধ হবে না।[১৩]

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুশরিকগণ

মুশরিকদের পূজা, উৎসব ও কর্মকাণ্ডসমূহ অনুকরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সৃষ্টির মাধ্যমে সুপারিশ প্রার্থনা করা এবং সৃষ্টিরাজিকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা, কবরের নিকট মান্নত করা ও (পশু-পাখি) যবাই করা ইত্যাদি। তদ্রূপ মুশরিকদের যেসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো: সূর্যাস্তের পূর্বে 'আরাফাত' এর ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন মুশরিকদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করতেন, যেমনটি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস রাদিয়াল্লাহ 'আনহুমা এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেছেন:

«من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت , حشر معهم يوم القيامة».

[১৩] পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে অন্যতম একটি পোষাক হলো প্যান্ট, যাকে আজকের দিনের কাফিরগণের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়, মুসলিমদের দেশে তা পরিধান করা বৈধ হবে না। যদিও আমরা দেখতে পাই যে, এ্যাংলো-ইউরোপীয়ান সভ্যতার ধ্বজাধারীদের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত মুসলিম দেশে এ শ্রেণির লোকের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাদের এ অবস্থাটি বিবেচনায় আনা হবে না, বিবেচনায় আসবে সঠিক ও দীনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অবস্থা, প্যান্ট পরিধান করা সৎ লোকদের চিহ্ন নয়। তাছাড়া প্রচলিত প্যান্ট লজ্জা নিবারণেও পর্যাপ্ত নয়। কারণ, তা লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দেখায়। আর এটাও জানা আবশ্যক যে, কোনো কোনো নিদর্শন কাফেরদের বিশেষ অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ইয়াহূদীদের বিশেষ টুপি এবং খ্রিষ্টানদের ক্রুশ ইত্যাদি।

“যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে গৃহ নির্মাণ করে, তাদের ‘নওরোজ’ (নববর্ষ) ও ‘মেহেরজান’ (জাতীয় দিবস) এর উৎসব পালন করে এবং এ অবস্থায় মারা যায়, কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে তার হাশর হবে”।[১৪]

আর আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা মসজিদের উপর বিশেষ কক্ষ বানানোকে অপছন্দ করতেন এবং বেশ কয়েকবার তিনি এ ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করেছেন। কারণ, তিনি এটাকে মুশরিকদের প্রতিমা সদৃশ মনে করতেন।[১৫]

তৃতীয় শ্রেণি: আহলে কিতাব

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আমাদেরকে এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা ইয়াহূদী ও নাসারা অথবা তাদের কোনো এক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। তাদের ইবাদাত, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও উৎসবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, কবরকে মসজিদ বানানো, ছবি উত্তোলন করা, নারীদের দ্বারা ফেতনায় পতিত হওয়া, সাহরী না খাওয়া, শুভ্র চুলে রং না করা, ক্রুশ উত্তোলন করা এবং তাদের উৎসবসমূহ উদযাপন করা অথবা তাতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণি: অগ্নিপূজক

অগ্নিপূজকদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আগুনের দিকে ফিরে পূজা করা, অগ্নিপূজা করা, রাজা ও বাদশাহদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা

---

[১৪] সুনানুল বায়হাকী, ৯/২৩৪

[১৫] দেখুন: ইবন আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ: ১/৩০৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩৪৪ (তাহকীকসহ)।

করা, মাথার সামনের অংশ বাদ দিয়ে পিছনের অংশের চুল কর্তন করা, দাঁড়ি মুণ্ডন করা, মোচ লম্বা করা, শিস দেওয়া এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা।

পঞ্চম শ্রেণি: পারস্য ও রোমের অধিবাসী

এ শ্রেণিটি আহলে কিতাব, অগ্নিপূজক ও অন্যান্যদেরকে শামিল করে। ইবাদাত, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করার ক্ষেত্রে পারস্য ও রোমবাসীর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুকরণ করা থেকেও আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে মহৎ ও পবিত্র জ্ঞান করা। এমন সব পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করা, যারা সে সব বিধিবিধান রচনা করে, যা আল্লাহ তা‘আলা অনুমোদন করেন নি এবং দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা প্রদর্শন করা।

ষষ্ঠ শ্রেণি: অনারব অমুসলিমগণ

আর এটা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার ওপর ভিত্তি করেই বলা হচ্ছে। কারণ হাদীসে এসেছে,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পুরুষ ব্যক্তি কর্তৃক অনারবদের মতো তার পোষাকের নিচের অংশে রেশম ব্যবহার করতে অথবা কাঁধের উপরের অংশে অনারবদের মতো রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন”।[১৬]

---

[16] আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪০৪৯; নাসাঈ, ৮/১৪৩; আহমদ, ৪/১৩৪; দেখুন: ইবন তাইমিয়্যাহ,

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতেও নিষেধ করেছেন; বরং তিনি কোনো সমস্যার কারণে বসা অবস্থায় সালাত আদায়কারী ইমামের মুক্তাদিকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এ আশঙ্কায় যে, কেউ এ দাঁড়ানোটিকে ইমামের সম্মানার্থে বলে মনে করবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত হাদীসে আগত এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এটি অনারবদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, তারা তাদের নেতৃবৃন্দ ও বয়স্কজনদের নিকট কেবল দাঁড়িয়েই থাকত। বস্তুত এটা নিষিদ্ধ; কারণ তা অনারব কাফিরদের অনুকরণ-অনুসরন বৈ কিছু নয়[১৭]।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সাব্যস্ত আছে যে, তিনি ভিনদেশী তথা অনারব ও মুশরিকগণের সাজসজ্জা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন আর পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই অনুরূপ ইঙ্গিত করেছেন।

সপ্তম শ্রেণি: জাহেলিয়াত ও তার অনুসারীগণ

জাহেলিয়াতের সকল কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ, পূজাপার্বণ, স্বভাব-চরিত্র ও বিশেষ নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ইসলামী শরী‘আতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, বেপর্দা হওয়া, নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, হজ ও উমরার ইহরামে প্রবেশ করার পর সূর্যের উত্তাপ থেকে ছায়া গ্রহণ না করা, অথবা এমন কাজ করা যাতে ছায়া গ্রহণ না করতে হয়। যেমনটি আজকের দিনের শিয়া-রাফেযীরা করে থাকে। কারণ, এগুলো জাহেলী যুগের ও মুশরিকগণের কর্মকাণ্ডের

ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩০৪।

[১৭] দেখুন: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪১৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬০২, ৬০৬, ৫২৩০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ১২৪০; মুসনাদু আহমদ, ৫/২৫৩, ২৫৬।

অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে লজ্জাস্থান বা তার অংশবিশেষ প্রকাশ করা, জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব, বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। কারণ, যখন ইসলাম আগমন করেছে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াতের সকল অবস্থা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রথা বা ঐতিহ্য, নিয়ম-কানূন, যাবতীয় মেলা, সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, নারী-পুরুষে মেলামেশা এবং সুদ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন।

অষ্টম শ্রেণি: শয়তান

যাদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো শয়তান। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের কতিপয় কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে তিনি নিষেধ করেছেন; যেমন, বাম হাতে খাওয়া ও পান করা। ইমাম মুসলিম রহ. প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا».

"তোমাদের কেউ যেন কখনও বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে"।[১৮]

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মুসলিমগণের অনেকেই খুব সহজেই অথবা হকের (সত্যের) প্রতি অহঙ্কার বশতঃ এবং কাফির ও ফাসিকগণের মধ্য থেকে শয়তানের বন্ধুদের অনুকর করত এ অভ্যাসে জড়িয়ে গেছে।

নবম শ্রেণি: বেদুইন বা যাযাবর শ্রেণি যাদের দীন পূর্ণ হয় নি

---

[১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২০১৯।

তারা হলো জাহিল বা মূর্খ বেদুইন। কারণ, বেদুইন বা যাযাবরগণ অনেক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, ইসলামের নিয়মনীতির সাথে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই; তার কিছু এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে জাহেলিয়াত থেকে। অভদ্র বেদুইনগণ তাদের চালচলন, রীতি-নীতি, প্রথা ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ছিল শরী'আত পরিপন্থী। এর দৃষ্টান্ত হলো: জাহেলিয়াতের পক্ষপাতিত্ব করা, বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা, মাগরিবের সালাতকে 'ইশা' বলে নামকরণ করা, এশার সালাতকে 'আতামা' বলে নামকরণ করা, তালাকের মাধ্যমে শপথ করা, তালাককে কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা; চাচার কন্যাকে (চাচাতো বোনকে) অন্যের জন্য হারাম করে দেওয়া; যাতে করে সে কন্যা তার চাচাতো ভাই ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে না পারে। ইত্যাদি আরও বিবিধ জাহেলী রীতি-নীতি।

****

সপ্তম বিষয়

মুসলিমগণ কর্তৃক কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের কারণ। যদিও তাতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়া

প্রথমত: এটা জানা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিমগণ কর্তৃক কাফেরদের অনুকরণ-অনুসরণ ও তাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ঘটনা ঘটেছে। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা এখনও ঘটেনি তা অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবে।

দ্বিতীয়ত: পূর্ববর্তী মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যারা কাফিরদের অনুকরণে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্যের অনুসারী নয় এবং তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতও নয়; বরং তারা প্রবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। আর যে দল বা গোষ্ঠীই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কাফিরদের সাথে কম-বেশি তাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

মুসলিমগণ কর্তৃক কাফিরদেরকে অনুকরণ করার গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ:

প্রথম কারণ: ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র

এ ষড়যন্ত্র ইসলাম আত্মপ্রকাশ করার প্রথম থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত চলছে। আকীদা-বিশ্বাস, ধর্ম ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে আর অব্যাহতভাবে তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়েই যাচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল মুসলিমগণ আকীদা-বিশ্বাস, স্বভাব-প্রকৃতি, উৎসব ও রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করা। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, এ উম্মাতের মধ্যে বিভক্তির মূল কারণ হচ্ছে

কাফিরদের ষড়যন্ত্র। কোনো গোষ্ঠীই যখন মুসলিম উম্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমরা দেখতে পাব যে, তাদের বিচ্ছন্নতার কারণসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম কারণ হলো কাফিরদের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর উপস্থিতি; হয় তারা মুসলিমগণের মধ্য থেকে প্রবৃত্তির পূজারী ব্যক্তিবর্গ ও সাদাসিধে লোকদের মাঝে সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা প্রচলন করার কাজে অংশগ্রহণ করত, অথবা তারা সরাসরি এসব এসব সাদাসিধে মানুষগুলোর নেতৃত্ব দিত অথবা তাদের অনুসারী সেজে যেতো। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, কাফির তথা বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রই মুসলিমগণকে কর্তৃক কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ। আর আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন:

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ﴾ [البقرة: ١٢٠]

“আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২০]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ﴾ [ال عمران: ١١٨]

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْۚ﴾ [البقرة: ١٠٥]

"কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০৫]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ١٤٩﴾ [ال عمران: ١٤٩]

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৯]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ١٠٠﴾ [ال عمران: ١٠٠]

"তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০০]

অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে, কাফিরদের ঐকান্তিক কামনা-বাসনা হলো মুসলিমগণকে তাদের দীন থেকে বিচ্যুত করা বা সরিয়ে দেওয়া। তারা (এ লক্ষ্যে) এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টাসাধনা

করছে। গোটা বিশ্বে বর্তমানে মুসলিমগণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকারী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিই আজকের দিনে মুসলিম জাতির ওপর কাফিরদের প্রকাশ্য শত্রুতার ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পারবে। কাফিররা চায় তাদের আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, রাজনীতি, চরিত্র ইত্যাদি মুসলিমগণের ওপর চাপিয়ে দিতে। কাফিররা ও তাদের সহযোগীরা মুসলিম জাতিকে তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করানোর জন্য অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ।

দ্বিতীয় কারণ: মুসলিমগণের অংশবিশেষের অজ্ঞতা এবং দীন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব

দীনের বিধিবিধান এবং সালফে সালেহীনের রীতিনীতি সম্পর্কে মুসলিমগণের অজ্ঞতা তাদেরকে কাফেরদের অনুকরণ-অনুসরণে লিপ্ত করেছে।

তৃতীয় কারণ: মুসলিমগণের বস্তুগত, অভ্যন্তরীণ ও সামরিক দুর্বলতা

বস্তুগত, আভ্যন্তরীন ও সামরিকভাবে মুসলিমগণ দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে দুর্বলতা ও পরাস্ত হওয়ার অনুভূতি কাজ করে। তারা অনুভব করছে যে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ওপর কাফিরদের প্রাধান্য রয়েছে।

চতুর্থ কারণ: মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

এ মুনাফিকরা মুসলিমগণের মাঝেই বসবাস করে, তারা কাফিরদের সেবায় প্রাচীন ও আধুনিক কালে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও শক্তিশালী অস্ত্র। সুতরাং যেসব মুনাফিক মুসলিমগণের মাঝে অবস্থান করে, মুসলিমদেরকে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। এখানে মুনাফিক বলতে কয়েক ধরণের লোক উদ্দেশ্য:

তন্মধ্যে এক ধরনের রয়েছে, যারা কাফির সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করেছে বস্তুত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যই তাতে প্রবেশ করেছে।

আরেক ধরনের লোক রয়েছে, যে মূলত মুসলিম ছিল কিন্তু সে দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে ও বিপথগামী হয়ে গেছে।

আরেক ধরনের লোক রয়েছে, যে অন্যায় ও অপরাধে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে। তাদের অনেকেই এমন রয়েছে, যারা মুসলিমগণকে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারা ঐ শ্রেণির লোকজনের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর যারা কামনা-বাসনা করে যেন মুসলিমদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, যেমন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও তাদের মত লোকেরা পছন্দ করে।
মোটকথা: মুসলিমগণ কর্তৃক কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণে লিপ্ত হওয়ার কারণ অনেক।

******

অষ্টম বিষয়

কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার কতিপয় নমুনা

প্রথমত: সর্বপ্রথম কাফিরদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে শরী'আতে স্পষ্টভাবে যে নিষেধাজ্ঞাসূচক বক্তব্য এসেছে, তা হলো দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।

আর এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় অনেক বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ﴾ [ال عمران: ١٠٥]

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫]

অনুরূপভাবে এ উম্মতের বিভক্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেন:

«افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة».

"ইয়াহূদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর খ্রীষ্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর এ উম্মাত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে"। বস্তুত এ বিভক্তির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য নিষেধাজ্ঞামূলক ও সাবধানতাসূচক।

দ্বিতীয়ত: কবর উঁচু করা, তার ওপর স্মৃতিসৌধ বানানো, তাকে মাসজিদ বানানো, ভাস্কর্য বানানো এবং ছবি উত্তোলন করা। আর এ বিষয়গুলো হাদীসের অনেক ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে; তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ইমাম মুসলিম রহ. ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«أمرني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتُهُ , وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتُهُ ».

"আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যাতে সকল উঁচু কবরকে ভেঙ্গে দেই এবং সকল ভাস্কর্যকে বিলুপ্ত করি"।[১৯]

ইবন 'আসেম রহ. সহীহ সনদে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«إن تسوية القبور من السنن وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم».

"কবরসমূহকে সমান করে দেওয়া সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আর ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা কবরকে উঁচু করেছে। সুতরাং তোমরা তাদের অনুকরণ করো না"।[২০] অর্থাৎ তোমরা কবরের ওপর উঁচু ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করো না। আর এ দূর্যোগ অর্থাৎ কবরের ওপর উঁচু ভবন নির্মাণ করা অথবা প্রকৃত অর্থে কবরকে উঁচু করা হলো অন্যতম মহাদূর্যোগ, যার দ্বারা আজকের দিনে মুসলিমগণ তাদের অধিকাংশ অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছে; আর এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেরই যথার্থ প্রতিধ্বনি, তিনি বলেছেন:

---

[১৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯৬৯।

[২০] ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩৪২

«لَتَركَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم».

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে”।[২১]

আর এ মহাদুর্যোগের অন্যতম আরেকটি দূর্যোগ হলো নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানো। তাঁদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানোর অর্থ হলো, তার ওপর ভবন নির্মাণ করা, মসজিদ বানানো এবং এসব মসজিদে সালাত আদায় করা।

অনুরূপভাবে সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে, সৎকর্মশীলদের কবরের উপর ভবন নির্মাণ করা, অথবা মাসজিদসমূহে সৎকর্মশীলদের দাফন করা, যদিও তা নির্মাণ কাজের পরবর্তীতে হউক না কেন, এর প্রত্যেকটিই উক্ত নিষিদ্ধের আওতাভুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে, কবরের নিকট দো‘আ করার উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহ ব্যতীত কবরবাসীকে ডাকার উদ্দেশ্য অথবা তার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা। আর এ সকল কর্মকাণ্ডের সবই ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের কর্মকাণ্ড ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কাজ থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলেছেন:

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ

[২১] তার তথ্যসূত্র পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ!!».

"তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চেয়েছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও সৎলোকদের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মাসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি"!![২২]

আর সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«قاتل اللَّهُ الْيَهُودَ , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

"আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"।[২৩]

সহীহ মুসলিমের ভাষায়:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"[২৪]

---

২২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৩২

২৩ সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৪৩৭

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন:

«لما نزل برسول الله صلى الله عليه و سلم (مرض موته) طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وقال : وهو كذلك «لعنة الله على اليهود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما صعنوا».

"যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন তিনি তাঁর চেহারা থেকে তা সরিয়ে ফেললেন; আর তিনি অসুস্থতার এমন অবস্থায় বললেন: "ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত, তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন"।[২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালমা ও উম্মু হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার কাহিনীতে বলেন, যখন তাঁরা হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জার সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন, যাতে বেশ কিছু ছবিও ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل» .

---

[২৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৩০

[২৫] সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৪৩৫, ৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৩১

"এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত আর তাতে ঐসব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করত; এরা হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি"।[২৬]

আর আজকের দিনে মুসলিমগণ যেসব মুসিবতের শিকার হয়েছে, এগুলো সেসব মহা-মুসীবতের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত: মুসলিমগণ কাফেরদের সাথে যে বিষয়ে সবচেয়ে বড় ও বিপদজনক পর্যায়ে অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে সামঞ্জস্যতা বিধান করছে তা হলো, নারীদের মাধ্যমে ফেতনায় নিপতিত হওয়া। কেননা, এটা কাফিরদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নারীদের মাধ্যমে ফেতনায় নিপতিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট বলয় থেকে এবং তাদের পর্দা ও শালীনতা থেকে বের করা, যাতে তাদের প্রতি পুরুষগণ আকৃষ্ট হয়।

আর এসব বিষয়ে নারীদেরকে বিশেষভাবে গ্রহণ করার কারণ:

১. নারীগণ দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়।

২. তারা এ ক্ষেত্রে অতিবেশি অনুসরণ, অনুকরণ ও অতিরঞ্জন প্রিয়।

৩. নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষকে প্রলুব্ধ করা ও তার জন্য সাজগোজ করার স্বভাব দিয়ে। আর পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শালীনতাবিহীন, পর্দাহীন সুসজ্জিতা নারীর প্রতি ঝুঁকে পড়ার স্বভাব দিয়ে।

---

[২৬] সহীহ বুখারী/ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৪২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫২৮।

আর আহলে কিতাব ও কাফিরদের বহু স্বভাব, চরিত্র ও উৎসবের অনুসরণ-অনুকরণ প্রথমেই নারীরা করে থাকে, অতঃপর শিশু ও সাদাসিধে বোকা লোকেরা করে থাকে।

আর দুঃখের বিষয় যে, এ প্রবণতা অর্থাৎ নারীদের ফেতনায় নিপতিত হওয়া, এ যুগের মুসলিমগণের অধিকাংশ পুরুষ এতে জড়িয়ে পড়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

«... فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ».

"...সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর, আর ভয় কর নারীদেরকে; কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল নারীদেরকে নিয়ে"।[২৭]

সুতরাং যখন নারীকে কিছু পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং যখন পুরুষগণ নারীদের প্রতি কোমল হবে, তখন তা যেন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে হয়[২৮]। কিন্তু যখন তারা শালীনতা ও পর্দার মূলনীতি থেকে সরে যাবে, তখন এটা হবে ফেতনা ও বিপর্যয়ের পথ। আর সাধারণত যখনই মুসলিম জাতি এ রকম বিপর্যয়ে জড়ি পড়বে তখনই তা তাদের দীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করবে এবং তাদের ওপর ফেতনা-ফাসাদ ভর করবে।

চতুর্থত: কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্ম হওয়ার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম একটি

---

[২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৭৪২

[২৮] নারীকে সম্মান করা একটি শরী'য়ত সম্মত বিষয় আর তাকে সম্মান করার অর্থ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করা নয় এবং তার জন্য পুরুষ কর্তৃক তার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া নয়, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণের অনুকরণার্থে শুভ্র কেশে রং ব্যবহার না করা। কারণ, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ».

“নিশ্চয় ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণ (দাঁড়ি ও চুলে) রং বা খেযাব লাগায় না। অতএব, তোমরা (রং বা খেযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর”।[২৯] তবে এ ক্ষেত্রে কালো রং পরিহার করতে হবে, যেমনটি (হাদীসের) অন্যান্য ভাষ্য থেকে জানা যায়।

পঞ্চমত: দাড়ি মুণ্ডন করা ও গোঁফ কামিয়ে ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে; কারণ, এ কাজটিকে মুশরিক, অগ্নিপূজক, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুকরণ বলে গণ্য করা হয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীসের মধ্যে দাঁড়ি লম্বা করা ও গোঁফ ছোট করার নির্দেশটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, তা হলো মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ। তিনি বলেছেন:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

“তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে, তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা রাখবে।”[৩০]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে:

---

[২৯] সহীহ বুখারী/ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৩৪৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২১০৩।

[৩০] সহীহ বুখারী/ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৫৮৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৯

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ».

“তোমরা গোঁফ কেটে ফেল”।

যেমনটি ইমাম মুসলিম রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

“তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর আর (এভাবেই) তোমরা অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর”।[৩১]

ষষ্ঠত: কাফিরদের অনুকরণ করার ব্যাপারে **আরও** নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং সেখানে বিশেষ করে ইয়াহূদীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, তারা জুতা ও মোজা পরিধান করে সালাত আদায় করে না। সুতরাং স্থায়ীভাবে অথবা ইবাদত মনে করে জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা পরিহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তার সাথে কোনো ময়লা যুক্ত না হয়। কারণ এতে ইয়াহূদীদের কাজের বিপরীত করা হবে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম রহ. এবং হাকেম রহ. বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, আর যাহাবী রহ. তার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ».

“তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর; কারণ, তারা তাদের জুতা ও মোজা পরিধান করে সালাত আদায় করে না”।[৩২]

---

[৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬০

[৩২] আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬৫২; হাকেম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর যাহাবী রহ. তাঁর বর্ণনার মত বর্ণনা করেছেন: ১/২৬০

অনেক অজ্ঞ ও বিদ‘আতী লোকই এ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত। যারা এ সুন্নাতটির উপর আমল করাকে অপছন্দ করে।

অবশ্য আলেমগণের নিকট জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করার বিষয়টি (জুতার সাথে) ময়লা বিদ্যমান না থাকার শর্তে (সুন্নাত)। কিন্তু যদি মসজিদ কার্পেট করা হয় এবং মসজিদের বাইরের পথ সংশ্লিষ্ট জমিন অপবিত্র হয়, যেমনটি শহরগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে, তখন বিছানার উপরে জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা শরী‘আত সম্মত নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মাটি বা বালির উপর সালাত আদায় করতেন এবং সেই সময়ে মাসজিদের সমতল ভূমিতে বিছানা বা পাকা ছিল না। আর তাই মুসলিম ব্যক্তির জন্য তখনই তা সুন্নাত হবে, যখন সে ফ্লোর পাকা বা কার্পেটিং করা মসজিদের বাইরে অন্য কোনো স্থানে তার জুতা পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আনুগত্যস্বরূপ কখনও কখনও সালাত আদায় করে, তবে স্থায়ীভাবে নয়; কারণ, পূর্ববর্তী আলেমগণের নিকট থেকে এটা স্থায়ীভাবে করা প্রমাণিত নয়।

সপ্তমত: নির্ধারিত দণ্ডবিধি এবং অন্যান্য পুরস্কার, তিরস্কার বা শাস্তি ও আইন প্রয়োগে সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্তের ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি করা, যেমনটি ইয়াহূদীগণ করত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চোরের পক্ষে সুপারিশ করার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

«يا أسامة! أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

“হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহের মধ্য থেকে একটি শাস্তি (চুরির শাস্তি হাত কাটা) মওকুফের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে (বনী ইসরাঈলকে) এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোনো দুর্বল (দরিদ্র) লোক চুরি করত, তখন তারা তার ওপর হদ তথা হাতকাটার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম”।[৩৩]

অষ্টমত: সালাতের মধ্যে ‘সাদল’[৩৪] বা কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে কাফিরদের অনুকরণ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে; আরও নিষেধ করা হয়েছে (সালাতের মধ্যে) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মুখ ঢেকে রাখাকে, যাকে ‘তালাচ্ছুম’ বা ‘মুখোশ পড়া’ বলে আখ্যায়িত করা হয়; কারণ, এটা ইয়াহূদীদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ ও হাকেম রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (হাকেম রহ.) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে বলেছেন:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ ».

---

[৩৩] সহীহ বুখারী/ফাতহুল বারী, হাদীস নং- ৩৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮৮

[৩৪] السدل في الصلاة -এর ব্যখ্যা: কাপড় ঝুলিয়ে রাখা, আর তা হলো সে তার এক কাঁধের উপর কাপড় রাখবে এবং অপর কাঁধের উপর রাখবে না।

“নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে ‘সাদল’ বা কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে এবং (সালাতের মধ্যে) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন”।[৩৫]

সাহাবীগণের কেউ কেউ এর কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, নিশ্চয় তা ইয়াহূদীদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

নবমত: নারী কর্তৃক সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, বেপর্দা এবং বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়া মানে কাফির ও জাহিলদের অনুকরণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

“আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]

আর আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«لا تبد العورة و لا تستن بسنة المشركين».

“তুমি লজ্জাস্থান প্রকাশ করো না এবং মুশরিকদের রীতিনীতি অনুসরণ করো না।”[৩৬]

দশমত: সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা: আর সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাজা বা কোমরে হাত রাখা। কারণ, সালাতের মধ্যে সুন্নাত হলো ব্যক্তি বা মুসল্লী তার বুকের উপরে তার ডান হাত বাম হাতের

---

৩৫ আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬৪৩; তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৮; আহমদ ও হাকেম।

৩৬ ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩৪০

উপরে রাখবে। সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, তা ইয়াহূদীদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে, তিনি সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখাকে অপছন্দ করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

«لا تشبهوا باليهود» وقالت : «إن اليهود تفعله».

"তোমরা ইয়াহূদীদের অনুকরণ করো না"। তিনি আরও বলেছেন: "নিশ্চয় ইয়াহূদীগণ এ কাজ করে"।[৩৭]

একাদশতম: বিবিধ উৎসব, অনুষ্ঠান ও পর্বসমূহ।

কারণ, আমাদের শরী'আতে এগুলোর বর্ণনা আসে নি। আর সর্বজন বিদিত যে, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর ব্যতীত শরী'আত সম্মত অন্য কোনো উৎসব নেই! বেশি বেশি উৎসব করা আহলে কিতাব, কাফির, মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের ধর্ম এবং জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমগণকে দু'টির বেশি ঈদ তথা উৎসব পালন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 'রহমান' এর বান্দাদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧١]

"আর যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না"। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭১]

পূর্ববর্তী মুফাসসীরগণের অনেকে বলেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুশরিক ও কাফিরদের উৎসবসমূহ; বস্তুত ইসলামী শরী'আতে উৎসবও শরী'আত

---

[৩৭] সহীহ বুখারী/'ফতহুল বারী', হাদীস নং- ৩৪৫৮; মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩৩৩৮; ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৩৪৩, ৩৪৪

অনুমোদিত বিষয় ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যা অবশ্যই দলীলভিত্তিক হতে হবে।[৩৮]

বাস্তবেই ঈদ-উৎসব ইসলামী শরী'আত অনুসারে অন্যতম ইবাদাত, আর তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে শরী'আতসম্মত উৎসব বলে নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে কোনো কিছু বাড়ানো কিংবা কমানো বৈধ নয়। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ কোনো মানুষ যদি উপলক্ষ যাই হউক জাতির জন্য তৃতীয় ঈদ-উৎসবের ব্যবস্থা করে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা ভিন্ন অন্য বিধান প্রবর্তন করার শামিল। অনুরূপভাবে যদি কোনো মানুষ আল্লাহর শরী'আত কর্তৃক স্বীকৃত ঈদ-উৎসবের কোনো একটিকে বাতিল করে দেয়, তাহলে এটাও শরী'আত প্রণয়ন বলে গণ্য হবে এবং তা বৈধ হবে না; বরং তা কুফুরী। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীকে তাদের কতিপয় সনাতন উৎসব ও পর্বকে পুনরায় চালু করতে বারণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ, আহমদ ও নাসাঈ রহ. ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন; বর্ণনাকারী (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন:

«قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ , وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا , فَقَالَ : «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ ». قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ». (أخرجه أبو داود) .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেছেন এমতাবস্থায় যে, মদীনাবাসীর জন্য নির্দিষ্ট দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা খেলাধুলা করে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এ দু'টি দিন কী? জবাবে তারা বলল: আমরা এ দু'টি দিনে জাহেলী যুগে খেলাধুলা করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ

৩৮ দেখুন: তাফসীরু ইবন কাছীর, ৩/৩২৮,৩২৯

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য (এ) দু’টি দিনের পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম কুরবানীর ঈদ ও ঈদুল ফিতরের দিনের ব্যবস্থা করেছেন”।[৩৯]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন:

«اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم».

“তোমরা আল্লাহ শত্রুদেরকে তাদের উৎসবসমূহের ব্যাপারে এড়িয়ে চল”।[৪০]

সুতরাং ঈদ-উৎসব আল্লাহর শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত। তাতে যত সঙ্গত কারণই থাকুক না কেন, কোনো ধরনের অতিরঞ্জন বা কমতি করা বৈধ হবে না।

আর বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে যেমনিভাবে জানা যায়, তাতে সময়ের ঘূর্ণিপাকে মুসলিমগণের পক্ষ থেকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি অনুষ্ঠানই নিষিদ্ধ উৎসবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, মাসিক অথবা বার্ষিক অথবা দ্বি-বার্ষিক অথবা পঞ্চবার্ষিক অথবা দশ বছর উপলক্ষে অনুষ্ঠান, চাই তা ‘দিবস’ হউক অথবা ‘সপ্তাহ’ হউক অথবা এ ছাড়া অন্য কিছু হউক। আর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান, যা জাতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পালন করে, তা উৎসব বলে পরিগণিত হবে, যদিও তা শরী‘আত নির্ধারিত উৎসবের মধ্যে গণ্য হয় না।

অনুরূপ আরও যেসব উৎসব নিষিদ্ধ উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হবে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, জাতীয় উৎসব, অথবা ক্ষমতাগ্রহণকেন্দ্রীক উৎসব অথবা বিভিন্ন উপলক্ষে

---

[৩৯] আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১৩৪; আরও দেখুন: ইবন তাইমিয়্যাহহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/৪৩২।

[৪০] বায়হাকী (আস-সুনান আল-কুবরা): ৯/২৩৪; দেখুন: কানযুল ‘উম্মাল, হাদীস নং- ১৭৩২।

আয়োজিত উৎসব অথবা বিজয় উৎসব অথবা বিভিন্ন ঋতুর উৎসবসমূহ অথবা অন্যান্য নামের উৎসবসমূহ।

আরও এর অন্তর্ভুক্ত হবে 'সপ্তাহ' নামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ, যখন জাতি একটি বিশেষ রূপ দিয়ে তা পালন করবে। যেমন, মসজিদ সপ্তাহ ও বসন্ত সপ্তাহ। সুতরাং যখন এ সপ্তাহটি এক সময় থেকে অন্য সময়ে পরিবর্তন না হবে, তখন তা বানানো নিষিদ্ধ উৎসবের মধ্যেই গণ্য হবে।

বস্তুত এটি বিদ'আতের বীজের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মানুষ যদি এ বিষয়টিকে চালু করার সময় শরী'আতের বিধিবিধানের কথা স্মরণে রাখে এবং তাতে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহারও করে, তাহলেও তা বৈধ হবে না; কারণ, অচিরেই এমন প্রজন্মের আগমন ঘটবে, যারা বুঝতে পারবে না এবং এ কর্মকাণ্ডসমূহকে উত্তরাধিকার সূত্রে এমন অবস্থার মধ্যে পাবে যে, তারা মনে করবে এগুলো জাতির জন্য আবশ্যকীয় কিছু; আর শরী'আত যা আবশ্যক করে না, এমন কিছুকে অপরিহার্য করা মানেই তাকে শরী'আত হিসেবে গণ্য করা। হ্যাঁ, শরী'আতসম্মতভাবে যা আবশ্যক নয়, তা যদি জনগণ তাদের নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেয় তবে তা শরী'আত হিসেবেই গণ্য হবে, চাই তাকে ঈদ-উৎসব নামে নামকরণ করা হউক, অথবা দিবস, সপ্তাহ, মাস, পর্ব, অনুষ্ঠান, মেহেরজান[৪১] ইত্যাদি ধরনের যে কোনো নামেই নামকরণ করা হউক।

বিজ্ঞ আলেমদের মতে, কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সকল কর্মকাণ্ড বা বিষয়াদি নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো নিষিদ্ধ উৎসবের পর্যায়ে পড়ে!!

---

[৪১] 'মেহেরজান' বলতে পারসিকদের ঈদ উৎসব অথবা মহাসমাবেশকে বুঝায়। -অনুবাদক।

দ্বাদশতম: সাহরী খাওয়া পরিহার করা। যেমনটি করে ইয়াহূদী ও আহলে কিতাবদের। কারণ, তারা সাহরী খায় না। ইমাম মুসলিম রহ. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».

“আমাদের সাওম এবং আহলে কিতাবদের সাওমের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া”।[৪২]

আর আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এ সময়ে অনেক মুসলিম এ সাবধান করা কাজে জড়িয়ে যায়; বিশেষ করে তারা সাহরীর সময়ের কাছাকাছি পর্যন্ত জাগ্রত থাকে, অতঃপর তারা ঘুমায় এমতাবস্থায় যে তারা খাওয়া-দাওয়া করেছে অর্ধেক রাতে অথবা এর পূর্বে, অথবা তারা খায় নি। সুতরাং ঐসব মুসলিমের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা ইচ্ছাপূর্বক সাহরী খাওয়া ছেড়ে দেবে, এটা জায়েয নেই; বরং তা কাফির ও ইয়াহূদীদের রীতি-নীতির অন্তর্ভুক্ত।

তাতে যদি কেবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করার গুনাহই হতো তবে তা-ই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: ٦٣]

---

৪২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০৯৬।

“সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩]

ত্রয়োদশতম: ইফতারকে বিলম্বিত করা। কারণ, সাওম পালনকারীর জন্য দ্রুত ইফতার করা সুন্নাত এবং তা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধাচরণ করা। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম রহ. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ».

“দীন ততক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ লোকজন দ্রুত ইফতার করবে। কারণ, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণ ইফতারকে বিলম্বিত করে”।[৪৩]

আর কিছু সংখ্যক মানুষ এ অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে; আর এটি বেশি পরিমাণে দেখা যায় শি‘আ-রাফেযী সম্প্রদায়ের মধ্যে। কারণ, শি‘আরা মাগরিবের সালাতকে বিলম্বিত করে এবং তারা ইফতারকে তারকারাজি ঘন হয়ে দেখা দেওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করে!!

অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ সতর্কতা অবলম্বনের নামে ও দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করার দিক থেকে ইফতার করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করে থাকে। এসব লোক কখনও কখনও মুয়াযযিনদের প্রতিও আস্থা রাখে না, এমনকি তারা তাদের নিজ চোখে সূর্য অস্ত দেখার প্রতিও আস্থা রাখতে পারে না; ফলে তারা তাদের পক্ষ থেকে এটাকে সতর্কতার পর্যায় মনে করে

---

[৪৩] আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৩৫৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ১৬৯৮; হাকেম রহ., আল-মসতাদরাক: ১/৪৩১ এবং তিনি হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তের বিচারে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইফতারের সময়কে বিলম্বিত করে। বস্তুত এটা হলো শয়তানের পক্ষ থেকে এক ধরনের কুমন্ত্রণা (সংশয়) ও তামাশা। কারণ, তা করা মানেই তো নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে যাওয়া। কারণ সাহরী খাওয়াকে বিলম্বিত করা এবং ইফতার শুরু করতে দেরী না করাই হলো সুন্নাত।

হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইয়াহূদীগণ মাগরিবের সালাতকে ঘন হয়ে তারকারাজি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করে। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম রহ. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, আর অনুরূপভাবে ইবন মাজাহ ও আহমদ রহ. (আল-মুসনাদে) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم ».

“আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ তারা মাগরিবের সালাতকে তারকারাজি ঘন হয়ে দেখা দেওয়া পর্যন্ত দেরী না করবে (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে)।”[৪৪]

আর এ বিষয়টিকে অন্যান্য হাদীসসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের কর্মের অনুরূপ।[৪৫]

---

[৪৪] আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪১৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ৬৮৯; আহমদ: ৩/৪৪৯; হাকেম রহ. (আল-মসতাদরাক) এবং তিনি হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তের বিচারে বিশুদ্ধ বলেছেন, ১/১৯০, ১৯১

[৪৫] ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. তার সনদকে সা‘ঈদ ইবন মানসুরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/১৮৪; ইমাম আহমদ রহ.-এর মতও অনুরূপ। আল-মুসনাদ: ৪/৩৪৯; ইবন আবি হাতেম, আল-মারাসীল: ১২১।

চতুর্দশতম: একত্রে খাওয়া এবং ঘরে এক সঙ্গে অবস্থান করা ও বসার ক্ষেত্রে ঋতুবর্তী নারীদেরকে বয়কট করা। কারণ, এমন আচরণ ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, তাদের স্ত্রীগণ যখন ঋতুবর্তী হত, তখন তারা তাদেরকে খাওয়ার সময় এবং ঘরে একত্রে বসার সময় বয়কট করে চলত।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুসলিমগণের কেউ কেউ, যারা মদীনাতে ইয়াহূদীদের (এ ধরনের) কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন, তারা এরূপ আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করে বলেন:

«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ».

"তোমরা সঙ্গম ব্যতীত (তাদের সাথে) সবকিছুই কর"।[৪৬]

পঞ্চদশতম: সূর্য উদয় এবং অস্তের সময় সালাত আদায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। কেননা, সূর্য উদিত হয় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে এবং কাফিরগণ তা উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় তাকে সাজদাহ করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যা ইমাম মুসলিম রহ. 'আমর ইবন 'আবাসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন আর তার অংশ বিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«... صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ , ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.... ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . ...».

[৪৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩০২

“...ফজরের সালাত কর। অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাক। কারণ, সূর্য উদিত হয়, যখন তা উদিত হয় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে এবং সেই সময় কাফিরগণ তাকে সাজদাহ করে।...অতঃপর তুমি সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাক। কারণ, সূর্য অস্তমিত হয় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে এবং সেই সময় কাফিরগণ তাকে সাজদাহ করে।...”[৪৭]

ষোড়শতম: কোনো ব্যক্তিকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। বিশেষ করে যখন ব্যক্তিটি এমন হয়, যার বিশেষ অবস্থান বা মর্যাদা রয়েছে এবং যখন সে মর্যাদাশীল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং (হাদীসের) অনেক ভাষ্যে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

এসব নিষেধাজ্ঞার মধ্য থেকে একটি হলো, যা বর্ণিত হয়েছে বসে বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে মুক্তাদিদের দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে, যখন ইমামের জন্য আকস্মিকভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, ফলে তিনি দাঁড়াতে সক্ষম হন না। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুক্তাদির জন্য উচিত হবে ইমামের মতো বসে বসে সালাত আদায় করা, ঐসব বিদেশী (অনারব) ব্যক্তিদের অনুসরণ বা অনুকরণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, যারা তাদের নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে বলেছেন, যা ইমাম আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন:

«إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا , وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا , وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا!!».

[৪৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৮৩২

“যখন ইমাম বসে বসে সালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে বসে সালাত আদায় করবে; আর যখন ইমাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা এমন আচরণ করবে না, পারস্যবাসীগণ তাদের নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যে আচরণ করে”!![৪৮]

অপর এক বর্ণনায় আছে:

«لاَ تُعظموني كَمَا تُعظّم الأَعَاجِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا».

“তোমরা আমার প্রতি এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করো না, যেমনিভাবে অনারব ব্যক্তিগণ একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে”।[৪৯]

আর ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন:

«إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ ».

“তোমরা এ মুহূর্তে যে কাজটি করেছ, তা পারস্য ও রোমবাসীদের অনুরূপ, তারা তাদের সম্রাটদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সম্রাটগণ থাকেন বসে”।[৫০] আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তখন, যখন সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে গেলেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার কারণে বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন।

---

[৪৮] আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬০২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ১২৪০

[৪৯] দেখুন: আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২৩০; তবে সুনান আবু দাউদের শব্দগুলো এ রকম: «لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا» (তোমরা এমনভাবে দাঁড়াবে না, যেমনিভাবে বিদেশী (অনারব) ব্যক্তিগণ একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে দাঁড়ায়)। -অনুবাদক।

[৫০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪১৩

সপ্তদশতম: বিলাপ করার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির ওপর শোক প্রকাশ করা, শোক প্রকাশার্থে উচ্চস্বরে বিলাপের আয়োজন করা এবং অনুরূপ অন্য কিছু করা, যেমনটি জাহেলি যুগে করা হত! কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

"যে ব্যক্তি (মৃতের জন্য) গাল চাপড়াবে অথবা জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে অথবা জাহেলী যুগের মতো বিলাপ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[51] আর আজকের মুসলিমগণের অনেকেই এ অভ্যাসে জড়িয়ে গেছে।

অষ্টাদশতম: বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। আর এগুলো জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ».

"আমার উম্মাতের মধ্যে জাহেলিয়াতের চারটি বিষয় রয়েছে, যা তারা ত্যাগ করছে না: বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ করা"।[৫২]

ঊনবিংশতম: স্বজাতিপ্রীতি অথবা স্বদলপ্রীতি অথবা স্বদেশপ্রীতি অথবা অনুরূপ কিছু। সুতরাং যে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব অথবা গর্ব ও পক্ষপাতিত্ব করার

---

[৫১] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

[৫২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯৩৫

উদ্দেশ্যে অনৈসলামিক পন্থা অবলম্বন করাটা জাহেলী যুগের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ».

"যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতির দিকে ডাকে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতির উদ্দেশ্যে লড়াই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের নীতির ওপর মারা যায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[৫৩]

আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ এ স্বজনপ্রীতি ঐসব মারাত্মক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাতে মুসলিমগণ প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে জড়িয়ে গেছে এবং ঐ স্বজনপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত যা বর্তমানে মুসলিমগণের মাঝে চেপে বসেছে, যার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছে এবং যা তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ এমন, যা মুসলিমগণকে বহু জনগোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত করেছে। আশা করা যায় বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নিরেট জাহেলী জাতীয়বাদের মারাত্মক কুপ্রভাব মুসলিমদের ওপর কত গভীর তা স্পষ্ট করে দিবে। আরও স্পষ্ট করবে কিভাবে তারা যালেমকে কেবল জাতীয়তাবাদের জন্য সাহায্য-সহায়তা করতে সচেষ্ট হয়।[৫৪]

---

৫৩ এ শব্দগুলো আবু দাউদের, হাদীস নং- ৩৯০৪; সহীহ মুসলিম (অর্থগতভাবে) হাদীস নং- ১৮৪৮।

৫৪ এর দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি জাহেলী শ্লোগানের অধীনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত আগ্রাসন। আর তা থেকে যা সৃষ্টি হয়, তা জাতীয়তাবাদী দলসমূহের পক্ষপাতমূলক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আর জাহেলী পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রবৃত্তির পূজারীগণ এ যুলুম ও সীমালংঘন করে।

অথচ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে সতর্ক করছেন; তিনি বলেছেন:

«مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِى رُدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ».

“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার সম্প্রদায়কে সাহায্য করে, সে ব্যক্তি হলো কূপে পতিত উটের মত, যাকে লেজে ধরে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়”।[৫৫]

বিংশতম: মহররম মাসের দশম দিন তথা আশুরার দিনে একটি সাওম পালন করা। কারণ, ইয়াহূদীগণ এ কাজ করে। আর ইমাম আহমদ রহ. 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما».

“তোমরা 'আশুরার দিনে সাওম পালন কর এবং সে ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচারণ কর; আর তোমরা তার পূর্বে একদিন অথবা তার পরে একদিন সাওম পালন কর”।[৫৬]

একবিংশতম: নারীদের পক্ষে পরচুলা লাগানো। আর পরচুলা লাগানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন চুল স্থাপন করা, যা আল্লাহ নারীর জন্য সৃষ্টি করেন নি, যেমনটি উয়াহূদীগণ করে থাকে। আর আমার দৃষ্টিতে তার দৃষ্টান্ত হলো যাকে 'বারুকা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, তা পরচুলা ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে। যখন তার দ্বারা নারী তার প্রকৃতিগত চুলকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে যখন আসলেই তার চুল না থাকে, তাহলে কতিপয় আলেম স্বামীর জন্য সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্য তাকে বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী ও

---

[৫৫] ইমাম আবু দাউদ রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং- ৫১১৮।

[৫৬] মুসনাদে আহমদ: ১/২৪১; আরও দেখুন: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১১৩৩।

মুসলিম রহ. মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি এক গুচ্ছ পরচুলা প্রসঙ্গে বলেছেন: (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি), তিনি বলতেন:

«إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

"বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এরূপ করা আরম্ভ করে"।[৫৭]

আর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود».

"আমি ইয়াহূদীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে এরূপ কাজ করতে দেখতাম না"।[৫৮]

দ্বাবিংশতম: হৃদয়ের কঠোরতা এবং আল্লাহর আয়াত ও যিকির শ্রবনে মন নরম না হওয়া। আর এটা ইয়াহূদীগণের বৈশিষ্ট্য, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ﴾ [الحديد: ١٦]

"যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসে নি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর বহু কাল

[৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫৫৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৭৪২।

[৫৮] দেখুন: ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ১/২৫৩।

অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৬]

আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।

ত্রয়োবিংশতম: বৈরাগ্যবাদ ও দীনের ব্যাপারে কঠোরতা। কারণ, এটা খ্রিষ্টানদের বড় বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। দীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন, যা আল্লাহ তা‘আলা বিধিসম্মত করেন নি, চাই তা ইবাদাতের ক্ষেত্রে হউক অথবা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হউক অথবা তা বিধিবিধানের ক্ষেত্রে হউক। যেমন, ইবাদাতের জন্য জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, জীবিকার জন্য চেষ্টাসাধনা না করা, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া, ব্যবসা বানিজ্য না করা, বৈধ জিনিসকে হারাম করে দেওয়া অথবা ধর্ম পালন করার জন্য তা (বৈধ জিনিস) বর্জন করা[৫৭]।

অথবা দীনের ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি করা, যার কারণে দীন ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি থেকে সে বের হয়ে যায়। আর বৈরাগ্যবাদ, যাকে তোমরা খ্রিষ্টানদের কাজ বলে জান। আল্লাহ তা‘আলা এর থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন:

«لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ».

[৫৭] আমি বৈরাগ্যবাদের কিছু ধরণ বা প্রকৃতি লক্ষ্য করি। ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে বা ধার্মিকের অভিনয় করার উদ্দেশ্যে অব্যাহতভাবে কিছু বৈধ জিনিস বর্জন করা। যেমন, জুতা পরিধান না করা, যানবাহনে আরোহন না করা এবং বৈধ প্রস্তুতকৃত সামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহারে অনাগ্রহ প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা মহাজ্ঞানী।

“তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপর কঠোরতা করো না, তাহলে তোমাদের ওপর কঠোরতা করা হবে; কারণ, কোনো এক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ওপর কঠোরতা করেছে, ফলে আল্লাহ তা‘আলাও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছেন। গীর্জা ও ঘরে সন্যাসী হিসেবে অবস্থান করে যারা রয়েছে তারা হচ্ছে সেসব লোকদের বাকী অংশ। তারা এমন বৈরাগ্যবাদ নতুনভাবে প্রবর্তন করেছে, যা আমরা তাদের ওপর ফরয করি নি”।[৬০]

****

[৬০] আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৯০৪।

সারকথা

হে ভাইসব! নিশ্চয় ‘তাশাব্বুহ’ তথা কাফের মুশরিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে তাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সম্পর্কে মুসলিমগণের গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ, আজকের মুসলিমগণের অনেকেই দীনের ক্ষেত্রে অনুকরণের মারাত্মক ও বড় বড় প্রকারসমূহে লিপ্ত হয়ে গেছে বরং তাদের কতগুলো দল বা গোষ্ঠী এমন সব কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে, যা কুফুরী, পথভ্রষ্টতা, শির্ক, বিদ‘আত অথবা এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধ। যদিও তার পক্ষ থেকে অনুকরণ করার বিষয়টি ছিল এমন, যাতে প্রাচীন কালের মুসলিমগণও লিপ্ত ছিল; কিন্তু বিষয়টি তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে নি, যে পর্যায়ে বর্তমান সময়ে পৌঁছেছে। সুতরাং এ যুগে আমরা অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের অনুসরণ করতে দেখতে পাচ্ছি; শুধু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন, সে ব্যতীত।

দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আজকের মুসলিমগণ অধিকাংশ বিষয়ে কাফিরদের অনুসারী। ইবাদাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয়ে অথবা আচার-আচরণজনিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যে অথবা এরূপ কোনো বিষয়ে। এক্ষেত্রে তারা আংশিক অনুসরণ করছে না; বরং আকীদা-বিশ্বাস, শরী‘আত, চরিত্র, চালচলন পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ জীবনের অধিকাংশ দিক ও বিভাগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অনুসরণকারী। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেসব আমদানি করা মানবরচিত আইন ও বিধিবিধান, যার মাধ্যমে তারা বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনকে বর্জন করেছে। ফলে অধিকাংশ মুসলিম আজ এমন কতগুলো দল ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যারা কাফিরদের রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহের কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য দ্বারস্থ হয়; বরং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে শালিস মানার চেয়ে তাদেরকে অধিক পরিমাণে শালিস মানে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে

মুসলিমগণ তাদের পরাজিত মন-মানসিকতা ও তাদের দীন থেকে তাদের পদস্খলনের কারণে নৈতিক চরিত্র, চালচলন ও প্রকাশ্য সত্য-সঠিক নীতি থেকে দূরে সরে গেছে। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম দেশে সুন্নাহ হয়ে গেছে অপরিচিত, কাফিরদের চরিত্র ও রীতিনীতি হয়ে গেছে আসল বস্তু। এটা এমন একটি বিষয়, যা সকলেই অবগত! আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমাদের এ দেশে অর্থাৎ সৌদি আরবে মুসলিমগণের বাহ্যিক চালচলনের অধিকাংশই ইসলাম অনুযায়ী অব্যাহত আছে। আর অব্যাহতভাবে নৈতিক চরিত্র, আচর-আচরণ, বিধিবিধান ও শাসনব্যবস্থা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত, তা রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য।

****

উপসংহার

উপসংহারে আমি আমার নিজেকে এবং আমার ভাইদেরকে শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি; আরও উপদেশ দিচ্ছি মুসলিমগণের কল্যাণ কামনা করার; তারা এ যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং আল্লাহর শুকরিয়ায় এ দেশে আমাদের নিকট তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদের) আকীদা, বিদ'আতের কমতি, সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন, শরী'আতের দণ্ডবিধিসমূহের বাস্তবায়ন, আল্লাহর বিধানকে শালিস মানা এবং এগুলো ছাড়া বাহ্যিক সুন্নাহর বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যা বিদ্যমান রয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণ করার। আর আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য আবশ্যক, তা হলো এ দুশ্চরিত্রের ধারা এবং কাফিরদের অবস্থাদি ও কর্মকাণ্ডসমূহের মহামড়ক বন্ধ করা, যা আমাদের নিকট পৌঁছতে থাকে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে!!

আর আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি এ প্রার্থনাই করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখেন এবং মুসলিম অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন; আর তিনি যেন আমাদেরকে (হাশরের ময়দানে) নবীগণ, সত্যবাদীগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথে সমবেত করেন; (তাঁর নিকট আরও প্রার্থনা) তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং আমাদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে দুরে সরিয়ে রাখেন।

و صلى الله و سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

“আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম পেশ করুন”। (আমীন)

সমাপ্ত